অদ্বৈতবাদ

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ পাত্র

॥ পরিবেশক ॥

পুরুলিয়া বুক এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

॥ উৎসর্গ ॥

যাঁর ভাষ্য-কিরণে

বৌদ্ধবাদ-অন্ধকার-রাশি অপসারিত হইয়া

বৈদিক ধর্ম্ম

স্বীয় মহিমায় পুনঃ উদ্ভাসিত হইয়াছে,

যাঁর অলৌকিক কার্য্যকলাপ

বিশ্বের মনীষিবৃন্দের বিস্ময়ের বিষয়—

সেই জগদ্বরেণ্য আচার্যপ্রবর শঙ্করের

জ্ঞানামৃতবর্ষী চিন্তাধারা হইতে

সংগৃহীত

"অদ্বৈতবাদ" নামক গ্রন্থখানি

তাঁরই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিনীত—

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ পাত্র (শর্ম্মা)

গ্রাম ও পোষ্ট—কেশিয়া,

বাঁকুড়া

অদ্বৈতবাদ

॥ শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ॥

অনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতীয়সচিবস্য প্রভবতো
বিবর্ত্তা যস্যৈতে বিয়দনিল তেজোববনয়ঃ ॥
যতশ্চাভূদ্বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদং
নমামস্তদ্ব্রহ্মাপরিমিতসুখং জ্ঞানমমৃতম্ ॥

॥ নমঃ শঙ্করায় ॥

জ্ঞানী-গুরু শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁর আশ্চর্য্য লেখনীনৈপুণ্যে পূর্ব্বাচার্য্যগণ-গৃহীত এই বৈদিক মতবাদ আরও বিশেষভাবে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। তিনি অদ্বৈতমত পুষ্টিসাধনের জন্য স্বরচিত ভাষ্যে নানা শ্রুতি, স্মৃতি-বাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া ও বহু অনড় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া যে এই বিচিত্র জগৎ-রহস্যের যথার্থ মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহা জগতের কোনও ধর্ম্মমতে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং একথা খুবই সত্য যে, বৈদিক ধর্ম্মের এমন শক্তিশালী প্রভাবশালী ও মহান্ প্রচারক বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

আজিও ভারতের চারিদিকে চারিটি মঠ সর্ব্বধ্বংসী কালকে কলা দেখাইয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া অতীত ভারতের এই মহামানবের নাম ও কীর্ত্তি বিশ্বজগতে ঘোষণা করিতেছে।... দ্বারকায় সারদা মঠ, নীলাচলে গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণাপথে শৃঙ্গেরী মঠ এবং সুদূর হিমালয়ের অধিত্যকায় যোশী মঠ। একদা কন্যা কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত যে ভাবধারার অভিযান চলিয়াছিল, এই মঠ চারিটি তাহারই মহাশিবির। একজন মহাপুরুষ নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা ভারতের চারিদিকে এই চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ। এই চারিটি মঠ শঙ্কর দিগ্বিজয়ের নিদর্শন। এই চারিটি মঠের সীমাভুক্ত দেশে এই একটি লোক বৌদ্ধ-প্লাবন হইতে মুমূর্ষু বৈদিক ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অপর অপর দেশের ইতিহাসে যেমন সব দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার কথা ঐতিহাসিকগণ জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে এই চারিটি মঠ তেমনি এক অসাধারণ দিগ্বিজয় কাহিনীর সাক্ষ্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে তাহা তরবারির দিগ্বিজয় নয়, জ্ঞানের দিগ্বিজয়...মানুষের রুধিরে তাহার বিজয় কাহিনী লেখা হয় নাই...তাহা লেখা আছে একটা জাতির হৃদয়ে; অক্ষয় জ্ঞান-জ্যোতির উজ্জ্বল অক্ষরে। সেইজন্য ভারত জগতের আদি ধর্ম্মগুরু আর্য্য ঋষিগণের সহিত সমান স্তরেই তাঁহার আসন নির্দ্দেশ করিয়াছে। যে অসাধারণ সাধনা ও প্রয়াসের দ্বারা একজন লোক কন্যা-কুমারিকা হইতে

হিমালয় পর্য্যন্ত, দ্বারকা হইতে ব্রহ্মপুত্রের পরপার পর্য্যন্ত এক বৃহৎ উপমহাদেশে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নব-অভ্যুদয় আনিয়া দিতে পারিয়াছিলেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ কতকগুলি রূপকথা ও কাহিনীর মধ্যেই হারাইয়া গিয়াছে।

সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের ইতিহাস আমরা বিশেষ কিছুই জানিনা, ইতিহাসের জীবলোক হইতে শঙ্কর পুরাণের কল্পলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের পরিচায়ক স্বরূপ কতকগুলি কাহিনী চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্য হইতেই এই অসাধারণ ব্যক্তিটির জীবনবৃত্তান্ত আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

দক্ষিণ ভারতের কেরল দেশে আলোয়াই নদীর তীরে কালাদিনামক গ্রামে শঙ্করাচার্য্য ৬৪৮ শকের ১২ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ একজন শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বিদ্যাধিরাজ। তাঁহার পুত্র শিবগুরু। শিবগুরুও অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়ে কেরল দেশে অমোঘ পণ্ডিত নামক একজন মহাবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যার সহিত শিবগুরুর বিবাহ হয়। কিন্তু বহুদিন যাবৎ তাঁহাদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় শিবগুরুর পত্নী পুত্রলাভের আশায় দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্করের আরাধনা করেন। সেই আরাধনার ফলস্বরূপ একটি পুত্রের জন্ম হয়। শিবগুরুর পত্নী ইষ্টদেবতা শঙ্করের নামানুযায়ী পুত্রের নাম রাখেন শঙ্কর।

শঙ্করের জন্মপরিগ্রহে মাতাপিতার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু শিবগুরু বেশিদিন পুত্রমুখ দর্শন-সুখ ভোগ করিতে পাইলেন না। শঙ্কর যখন মাত্র তিন বৎসরের শিশু সেই সময় শিবগুরু পরলোক গমন করিলেন।

শঙ্করের অনাথা জননী একাই পুত্রকে মাতা ও পিতার ন্যায় যত্ন সহকারে পালন করিতে লাগিলেন এবং বংশের জ্ঞান-মর্য্যাদা অনুসারে পুত্রকে শাস্ত্র শিক্ষা দিবার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। শৈশবে পুত্রের উপনয়ন-ক্রিয়া সমাধা করিয়াই শঙ্কর-জননী তাঁহাকে গুরুগৃহে অধ্যয়নার্থ পাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে, মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়সেই শঙ্কর সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলেন এবং গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া জননীর নিকট ফিরিয়া আসেন।

সেই সময়ে জননী আপনার মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ-বশতঃ ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া শঙ্করের জন্য একটি সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায় যাহার আগমনে তাঁহার শূন্য গৃহ আবার লক্ষ্মীশ্রীতে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। শঙ্কর তখন ভাবিতেছিলেন, নিজের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করিতে এবং তারপর সেই ব্রহ্মজ্ঞানের ফলকে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে……গৃহের মায়াবন্ধনে বন্দী হইয়া রহিলে চলিবে না। শঙ্কর অত্যন্ত মাতৃভক্ত পুত্র ছিলেন। জননীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ ছাড়া তিনি কি করিয়া ঘরের বাহির হইবেন? জননী চাহিতেছেন তাঁহাকে ঘরে বাঁধিতে, আর তিনি চাহিতেছেন

ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইতে। জননী চাহিতেছেন তাঁহার সংসারকে আনন্দময় করিয়া গড়িয়া তুলিতে, আর পুত্র কল্পনা করিতেছেন একটা মহাজাতিকে কি করিয়া অজ্ঞতার কবল হইতে রক্ষা করা যায়, কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রূর আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত রুদ্ধশ্বাস বৈদিক ধর্ম্মকে রক্ষা করা যায়। মহাপুরুষ-গণের জীবনে এমনি সন্ধিক্ষণ আসে, বৈজ্ঞানিক জগতে চাপ ও মাধ্যাকর্ষণের দ্বন্দ্বের মত সন্ন্যাসে ও সংসারে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়।

দিনের পর দিন যায়, শঙ্করের মন পথে বাহির হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। যদিও—

যদহরেববিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজ্যেৎ।

অর্থাৎ যখনই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ; তথাপি লৌকিক সদাচার রক্ষার্থ শঙ্কর জননীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া বাহির হইতে পারিলেন না। কি করিয়া তিনি জননীর আশীর্ব্বাদ পাইলেন তাহাও এক অলৌকিক কাহিনীর রূপ গ্রহণ করিয়া আমাদের নিকট আসিয়াছে।

কথিত আছে এক সময়, যখন তিনি স্নান করিতেছিলেন, সেই সময় এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার জননী স্নানার্থ তাঁহার সহিতই নদীতে আসিয়াছিলেন ; তিনি স্নান সমাপণ করিয়া শঙ্করের সহিত গৃহে যাইবেন ইচ্ছা করিয়া নদীর তীরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শঙ্করের বিপদ বুঝিয়া জননী কাঁদিয়া উঠেন এবং কাতরভাবে তাঁহাকে জল হইতে উঠিয়া

আসিবার জন্য ডাকিতে থাকেন। এই সময় শঙ্কর জননীকে বলিলেন, "মা আপনি যদি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন, তাহলেই আমি তীরে উঠিতে পারি ; নতুবা আমার জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই।" পুত্রের জীবনহানির ভয়ে ব্যাকুলা জননী তৎক্ষণাৎ সেই অনুমতি দেন এবং বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কুম্ভীরও তৎক্ষণাৎ শঙ্করকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এইভাবে জননীকে পুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি দিতে হয়।

জননীর অনুমতি লাভ করিয়া শঙ্কর ভারতের পথে-প্রান্তরে বাহির হইলেন। নর্ম্মদাতীরস্থ অরণ্য পার হইতে না হইতে তিনি পর্ব্বতগুহায় যোগসমাধিস্থ এক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইলেন। তাঁহার নাম গোবিন্দপাদ। শঙ্কর তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন এবং তাঁহার নিকটেই ব্রহ্ম-বিদ্যায় দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। নর্ম্মদাতীরের অরণ্যেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করেন। তখন গুরু গোবিন্দপাদ ভারতের জনসাধারণের জন্য ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিবার দায়িত্ব শঙ্করের উপরে অর্পণ করেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক মীমাংসাভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধ্যায়ের মধ্যে প্রত্যেক পাদের শেষে গুরু গোবিন্দপাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন।

কথিত আছে গোবিন্দপাদ গৌড়পাদের শিষ্য। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ভগবান্

শঙ্করাচার্য্য সেই কারিকার উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রণয়ণ করিয়া অদ্বৈত-বাদ জনসাধারণের পক্ষে সুগম করিয়াছেন। অনেকেই মনে করেন অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। অদ্বৈতবাদ যখন বৈদিক, তখন এই মতবাদ সুপ্রাচীন। তবে স্মরণকালের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবাদের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করিয়াছেন।

গুরুর আশীর্ব্বাদ লইয়া শঙ্কর কাশীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানে গুরুর আদেশপালনে আত্মনিয়োগ করিলেন। যখন তিনি কাশীতে দুরূহ জ্ঞানসাধনায় মগ্ন, কথিত আছে যে, তখন স্বয়ং ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্র আলোচনা করেন। শঙ্করের অসাধারণ মেধা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন এবং তাঁহাকে ভারতে বেদান্ত-মত প্রচার করিবার ভার অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হন।

সেকালে জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানপ্রচার অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। দূর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া, জ্ঞানব্রতীদের সেকালে বিদ্যালাভ ও প্রচার করিতে হইত। শঙ্কর সারা ভারতবর্ষ পায়ে হাঁটিয়া যেখানে যে জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য বাহির হইলেন। তিনি যেখানেই যান সেখানেই লোক তাঁহার ব্যাখ্যায় মোহিত হইয়া যায়। এইভাবে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতে এক নবযুগের আবির্ভাব হইল।

কিন্তু তিনি প্রাচীনপন্থী আচার্য্যগণের নিকট হইতেও কম

বাধাপ্রাপ্ত হন নাই। তখন এই প্রাচীনপন্থী আচার্য্যগণের মধ্যে প্রয়াগের কুমারিল ভট্ট ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি ছিলেন দ্বৈতবাদী, অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু শঙ্কর ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তিনি একমাত্র স্রষ্টাকেই স্বীকার করিতেন, সৃষ্টির পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না।

অদ্বৈতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে শঙ্কর প্রয়াগে কুমারিল ভট্টের নিকট উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া কুমারিল ভট্ট মুগ্ধ হইলেন। তবে তিনি শঙ্করের সহিত শাস্ত্রতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্র তোমার সহিত শাস্ত্রবিচার করিবে, যদি তাঁহাকে পরাজিত করিতে পার তাহা হইলে আমিও পরাজয় স্বীকার করিব।

কিন্তু দার্শনিক মতের এই দুই মহারথীর বাক্‌যুদ্ধে কে বিচারক হইবেন ? তখন কুমারিল ভট্ট বলিলেন—মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী তোমাদের দ্বন্দ্বে বিচারক হইবেন। শঙ্কর তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং মণ্ডন মিশ্রের আবাসস্থল মাহিষ্মতী নগরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতের জ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে এই বাগ্‌যুদ্ধ অমর হইয়া রহিয়াছে। ভারতের দুই জ্ঞান-গুরুর তর্কযুদ্ধে সেদিন বিচারক ছিলেন একজন ভারতীয় নারী। ইহাতে সুদূর অতীতেও ভারতীয় নারী-জাতির স্থান কত উচ্চে ছিল তাহা সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায়।

আঠার দিন ধরিয়া এই বিচার চলে এবং তাহার শেষে শঙ্করই জয়ী হন। উভয়ভারতী শঙ্করের কণ্ঠেই জয়মাল্য অর্পণ করেন। হয়ত নিজের স্বামীর পরাভবে উভয়ভারতীর অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নারী হইয়াও উভয়ভারতী সেদিন নিরপেক্ষ জ্ঞানীদের মতই বিচারবুদ্ধি হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। বিজয়ী শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চলিলেন।

এইভাবে জ্ঞানালোকে জ্যোতিষ্মান্ একটি যুবক একবস্ত্রে নগ্নপদে কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত, দ্বারকা হইতে ব্রহ্ম-পুত্রের পরপার পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের ন্যায় এক বৃহৎ উপমহাদেশে মৃতপ্রায় বৈদিক ধর্ম্মকে জ্ঞানের সঞ্জীবনী ধারাপ্রবাহে পুনর্জ্জীবন দান করেন। যেদিন দিগ্বিজয় শেষে শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপনা করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, সেদিন তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন নূতন জ্ঞানব্রতী মাথা তুলিয়া উঠিলেন। শঙ্করের ভাবধারা অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ অভিযানের হাত হইতে ভারত রক্ষা পাইল।

বর্ত্তমানকালে শঙ্করমতের ধারক এবং বাহক ভগবান্ রামকৃষ্ণের মানস-সন্তান স্বামী বিবেকানন্দের অতুলনীয় কৃতিত্বের কথা মনে হইলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আমেরিকার শিকাগোনগরে বিশ্ব-ধর্ম্ম মহাসভায় স্বামিজীর উদাত্ত-কণ্ঠ-নিঃসৃত বক্তৃতা-ঝটিকা-প্রবাহে পাশ্চাত্য দেশবাসীর মন হইতে

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার মেঘরাশি অপসারিত হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামিজী তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি দেন।

স্বামিজীর সেই বক্তৃতা আমেরিকাবাসীরা কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

আমেরিকার বিখ্যাত নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকা লিখিয়াছেন—

"Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in Parliament of Religions. After hearing him we feel how foolish it is to send Missionaries to this learned Nation."

"ধর্ম্মমহাসভায় যাঁরা যোগদান করেছেন, বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর বক্তৃতা শুনবার পর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই শিক্ষিত জাতির কাছে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক পাঠানো কতখানি মুর্খতা।"

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেই নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শঙ্করেতর বৈদান্তিক-গণের মধ্যে কোন প্রচারক এইরূপ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের এখনও জানা নাই। পণ্ডিত নেহরু তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "আমেরিকাবাসিগণ বিবেকানন্দকে প্রলয়ঙ্কর হিন্দু বলিত।"

ধর্ম্মমহাসভার উদ্যোক্তাগণ হিন্দুধর্ম্মের কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান নাই। কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল হিন্দুধর্ম্ম অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে পূর্ণ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় স্বামিজী রামনাদের রাজার অর্থানুকূল্যে আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রমের পর সৌভাগ্যবশতঃ আমেরিকাবাসিনী জনৈকা মহীয়সী মহিলার আন্তরিক চেষ্টায় ধর্ম্ম-মহাসভায় বক্তৃতাদানের অনুমতি লাভ করিয়া যে হিন্দু-ধর্ম্মের বিজয় নিশান সগৌরবে আকাশে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা শঙ্করমতেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ সত্যনির্দ্ধারণে স্বামিজী শঙ্করমতই অনুসরণ করিয়াছেন।

কথিত আছে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে কেদারনাথ তীর্থে গমন করেন এবং সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে যোগবলে ইহলীলা সংবরণ করেন।

যাঁর অখণ্ডনীয় যুক্তিপ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত, যিনি জগদ্‌গুরু এই মহিমামণ্ডিত উপাধি ভূষণে বিভূষিত, সেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষির প্রতি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় "মায়াবাদী" "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী" প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আমাদের বঙ্গদেশে শঙ্কর-মতের অসারত্ব প্রমাণে ঐ ঐ সম্প্রদায় হইতে কেতাবের পর কেতাব বাহির হইতেছে, তাহাতে কাহারও কিছু যেন বলিবার

নাই ; কিন্তু সেই সেই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের মতের সামান্য মাত্র সমালোচনায় অমনি জনসাগরে প্রতিবাদের তুমুল তরঙ্গ উত্থিত হয়। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। শঙ্কর যে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী" ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা পুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈববিহিতাং দেবী কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—অসৎ শাস্ত্র মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিয়া কথিত। হে দেবি! কলিতে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে আমি মায়াবাদ প্রচার করিব।

কিন্তু উক্ত শ্লোকটি যে শঙ্করাচার্য্যের নির্দ্দেশক তার নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ কি? এবং ঐ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্তও হইতে পারে।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারকের ছদ্ম আবরণে প্রায় বৌদ্ধমতই প্রচার করিয়াছেন, এই কথা যে শঙ্করকে বলা হইয়াছে, কি যুক্তিবলে তাহা স্বীকার্য্য হইবে? কারণ যিনি যে-মত অন্তরে পোষণ করিয়া থাকেন, সেই মতের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ থাকিবে ইহা স্থির নিশ্চিত এবং যতই গোপনীয়তা অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহার ভাষ্যমধ্যে, অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে, কার্য্যধারার মধ্যে, সেই মতের কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবেই। যদি না পাওয়া যায় তিনি আদৌ সেই মতাবলম্বী নহেন। যাঁহারা বলেন, শঙ্কর একজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী তাঁহারাই ত স্বমতের প্রতি অনুরাগবশতঃ

কতকগুলি বেদান্ত-বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডনসূত্রস্বমতের সমর্থক সূত্ররূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" আদি ৪২ সূত্র হইতে "বিপ্রতিষেধাচ্চ" ৪৫ সূত্র পর্য্যন্ত চারিটি সূত্রে ভাগবত মত খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন—ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত আছেন। বাসুদেব-ব্যূহ, সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ, প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, অনিরুদ্ধ-ব্যূহ—এই চারি প্রকার ব্যূহ তাঁহারই স্বরূপ। বাসুদেবের অপর নাম পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণের অপর নাম জীব, প্রদ্যুম্নের নামান্তর মন এবং অনিরুদ্ধের নামান্তর অহঙ্কার। এই চারি প্রকার ব্যূহের মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মুল কারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং তাঁহারা সেই পরা প্রকৃতির কার্য্য।......কিন্তু সূত্রের ভাবার্থ এই যে, অনিত্যত্বাদি দোষ প্রসক্ত হয় বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। জীব অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণের বিনাশে কার্য্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য ব্যাস "নাত্মাশ্রুতেনির্ত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (অ ২ পা৩সূ ১৭) এতৎ সূত্রে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ উৎপত্তিনিষেধপূর্ব্বক নিত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব ভাগবতদিগের প্রোক্তবিধ কল্পনা অসঙ্গত।

আরও দেখ, তাঁহাদের শাস্ত্রে বেদনিন্দাও আছে। যথা,—
"চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্
—ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনেতি-সিদ্ধম্।

"শাণ্ডিল্য চার বেদে পরমশ্রেয়প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।" এই সকল কারণে ভাগবত-দিগের ঐরূপ কল্পনা অসঙ্গত বলিয়া অগ্রাহ্য। আমরা দেখিয়াছি, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যের লেখনী এই "উৎপত্ত্য-সম্ভবাৎ" সূত্রে আসিয়া সহসা যেন শান্ত এবং করুণ ভাব ধারণ করিয়াছে। উক্ত সূত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মসী পরমত-খণ্ডনে অসিরূপেই কার্য্য করিয়াছে। জীবব্রহ্মের ভেদবাদী অন্যান্য বৈদান্তিকগণের ভাষ্য দেখার সুযোগ আমার ঘটে নাই; কিন্তু না দেখিলেও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, যিনি যেমন-ভাবেই ভাষ্য রচনা করুন, যেমনভাবেই বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করুন, কেহই বিনা বাধায় স্বমত স্থাপন করিতে পারিবেন না। কারণ বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বেদান্তবিরুদ্ধ মতই খণ্ডিত হইয়াছে। খণ্ডন পাদ খণ্ডনে সমাপ্ত হওয়াই শাস্ত্রীয় নিয়ম। ইহা "প্রকরণাৎ" সূত্রে ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়। সূত্রকার "উৎপত্ত্য সম্ভবাৎ" সূত্র কোন মত লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন? এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর হইবে না কি "ভাগবত মত" লক্ষ্য করিয়া? আরও দেখ, উক্ত পাদে সাংখ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, সেশ্বর সাংখ্য, পাশুপত ও ন্যায়মত খণ্ডনার্থ কেবলমাত্র

ভাগবত মত খণ্ডনার্থ চারিটি প্রযুক্ত হইয়াছে; ধীর চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না।

শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী হইলে তাঁহাদের পন্থাই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; নির্ম্মম-নিপুণ হস্তে বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার বৌদ্ধবাদখণ্ডন ভাষ্য আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়।

শঙ্করাচার্য্য পুনঃপুনঃ বৌদ্ধের শূন্যবাদের নিন্দা করিয়াছেন এবং শূন্যবাদ পরিহারের উদ্দেশ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

ন তাবদ্ উভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিৎ হি পরমার্থমালম্ব্য অপরমার্থ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ।

অথাতো আদেশো নেতি নেতি ইতি তত্র কল্পিতরূপ-প্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপবেদনমিদম্ ইতি নির্ণীয়তে। তদাস্পদংহীদং সমস্তকার্য্যং "নেতি নেতি" ইতি প্রতিষিদ্ধম্। যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণ শব্দাদিভ্যোঽসত্ত্বমিতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধনম্ নতু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ** তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ।

অর্থাৎ জগৎ ও জগতের আধার উভয়ের প্রতিষেধ উপপন্ন নহে, কারণ তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয়; কোন পরমার্থ আছেনই, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অপরমার্থ জগৎ বাধিত হইতেছে। "নেতি নেতি" শব্দ দ্বারা কার্য্যেরই প্রতিষেধ

সুসঙ্গত ; কারণ কার্য্য অসৎ, কল্পিত কথামাত্র। 'ইহা বাচারম্ভণ' শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতিষেধ হয়, নেতি নেতি "ইহা নয় ইহা নয়" এইরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত অবস্তুর প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য—ব্রহ্ম যাহার আস্পদ বা আধার —সেই কার্য্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি সকল কল্পনার মূল। অতএব ইহাই স্থির যে, ব্রহ্মে কল্পিত এই (অসৎ) প্রপঞ্চ বাধিত হইতেছে; ব্রহ্ম (যিনি সৎ বস্তু) অবশিষ্ট থাকিতেছেন।

এইসব আলোচনার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বৌদ্ধবাদের প্রতি শঙ্করাচার্য্যের লেশমাত্রও সমর্থন নাই। বিরুদ্ধবাদিগণ মায়াবাদের নামে অবজ্ঞাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন ; কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়, একমাত্র মায়াবাদই সৃষ্টিরহস্যের যবনিকা অপসারণে সক্ষম হইয়াছে, অন্যান্য মতবাদে বহু "কিন্তু" থাকিয়া যাইবে।

তাঁহারা হুঁসিয়ারি দিয়াছেন, শঙ্করপ্রবর্ত্তিত মতবাদ হইতে এমন এক উচ্ছৃঙ্খল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে যাহারা নিজদিগকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মের সহিত তুলিত করে। ফলে কর্ম্মহীনতা, কঠোরতা, লঘু-গুরুজ্ঞানহীনতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা, অনধিকারীর সংসার-বিমুখতা, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধভাবপ্রবণতা প্রভৃতি গুরুতর

দোষসমূহ সমাজকে দ্রুত অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতেছে। ইহার একটি চরম দৃষ্টান্ত একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রঙ্গচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—একজন স্বৈরিণীকে প্রতিবেশিনীরা গঞ্জনা দিলে, সে অদ্বৈতমতের দোহাই দিয়া বলিয়াছিল যে, যখন পতিতে ও উপপতিতে একই ব্রহ্ম বিরাজিত তখন উভয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য্য।

কালপ্রভাবে বহু আত্মঘাতী নীতি প্রবেশ করিয়া সমাজকে যে দুর্ব্বল অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে, ইহা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেইজন্য কি শঙ্করের অকলঙ্ক যশশ্চন্দ্রমায় কলঙ্ক আরোপ করা উচিত? যাহা সত্য, যাহা চিরন্তন, সনাতন, তাহার প্রচারে কি কখনও কাহারও দোষ হইতে পারে? শঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—শাস্ত্র যেমন স্বর্গকামী পুরুষের উদ্দেশে অগ্নিহোত্র যাগের উপদেশ দিয়াছেন, মুমূক্ষু পুরুষের প্রতিও সেইরূপ ব্রহ্মাত্মভাবের উপদেশ করিয়াছেন। অনধিকারীকে প্রদত্ত হয় নাই। উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারিয়া অনধিকারীর দ্বারা যথেচ্ছাচার সঙ্ঘটিত হইলে উপদেষ্টার কি কখনও দোষ হইতে পারে? বাদিগণ যদি আত্মানুসন্ধান করেন, দেখিতে পাইবেন কোন সম্প্রদায়ই দুর্নীতিমুক্ত নয়, বরং স্বসম্প্রদায়েই অধিক। ধর্ম্ম বা নীতি যে কোনো প্রচারকই হউন এবং তিনি যত বড় জ্ঞানী-গুণী হউন, এমন কোন রক্ষাকবচ আঁটিয়া যাইতে পারেন নাই যাহার বলে তাঁহার মতবাদ অক্ষুণ্ণ অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। কারণ

পরিবর্ত্তনশীলতাই জগতের নিয়ম। গীতা এই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

হে অর্জ্জুন! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ে আমি (ভগবান্) মায়াবলে আত্মদেহের সৃষ্টি করিয়া থাকি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

দেখ, যে কেরলে ভগবান্ শঙ্করসূর্য্য উদিত হইয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যার আবরক সমুদয় অন্ধকাররাশি বিনাশ করিয়া লুপ্তপ্রায় বৈদিক সত্যকে পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কালের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে সেই কেরলই আজ ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য অপেক্ষা অধিক জড়বাদী কমিউনিষ্ট প্রভাবান্বিত। শঙ্করাচার্য্য যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ পবিত্র করিয়াছিলেন, ধন্য করিয়াছিলেন, শোনা যাইতেছে সেই পবিত্র বংশোদ্ভূতই একজন নাকি মাকালফলতুল্য অন্তঃসারশূন্য মার্ক্‌স্‌বাদে মানব-জাতির মঙ্গল নিহিত আছে দেখিতে পাইয়া তাহার প্রচারে মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অসংখ্য জ্ঞানীগুণীর পূতভাবধারাস্নাত পশ্চিমবঙ্গেও কমিউনিষ্ট-

গণের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বিষয় হইতে ভিন্ন হইলেও এই প্রসঙ্গে কমিউনিজম্ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেই হইবে। কারণ অধুনাতন কালে এই আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

বর্ত্তমান বিশ্বে কমিউনিজম্ নামক এক অদ্ভুত মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। কমিউনিজমকে আমরা বাংলায় বলি সাম্যবাদ। কথাটা শুনিতে খুবই ভাল। কিন্তু দেখিতে শুনিতে ভাল হইলেই যে বস্তুটি ভাল হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কমিউনিজম্ যুক্তিসঙ্গত না যুক্তিবর্জ্জিত ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

ইউরোপে সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগারিয়া, আলবানিয়া, পূর্ব্ব-জার্ম্মানি ও যুগোশ্লাভিয়া—এই নয়টি দেশ, এশিয়ায় চীন, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনাম—এই চার দেশ, এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধে কিউবা মোট এই চোদ্দটি দেশের একশ কোটীরও বেশী লোক এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। এবং বাকি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও বা পরোক্ষভাবে এই মত প্রচারের অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে।

কমিউনিষ্টগণ জড়বাদী। ধর্ম্ম, ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন না। কমিউনিষ্ট দেশে ধর্ম্ম যে কুসংস্কার-প্রসূত ইহা জনসাধারণকে নানাভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। সাধারণতঃ তাঁহারা এইরূপ ধরণের কথাই বলিয়া থাকেন—ধর্ম্ম নামক কল্পিত পদার্থটির দ্বারা জগতে যত

অত্যাচার, যত উৎপীড়ন, যত মানবিকতার অবমাননা; যত রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, এমন কোন কিছুর দ্বারা হয় নাই। সুতরাং কুসংস্কার-ভিত্তিক মনগড়া এই ধর্ম্মনামক পদার্থটির অবসান ঘটাইতে হইবে। এবং ধর্ম্মপুষ্ট, কোলের দিকে ঝোল টানা শোষক শ্রেণীর হস্ত হইতে নিপীড়িত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অনাহারক্লিষ্ট, অর্দ্ধোলঙ্গ, জগতের বৃহত্তর মূক মনুষ্য সমাজকে মুক্ত করিতে হইবেই হইবে। ইহাতে যতই ত্যাগ স্বীকার করিতে হোক না কেন; এমন কি এইজন্য যদি অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাও হাসিমুখে বরণ করিয়া লইব। কারণ ইহাই মানবতা। অর্থাৎ মানবদেহ ধারণের পরম সার্থকতা।

কমিউনিজম সম্বন্ধে সব কিছু জানা না থাকিলেও এইটুকু জানি যে, কমিউনিষ্টগণ জড়বাদী, তাঁহারা ধর্ম্ম, ঈশ্বর, পরলোক ও আত্মার অমরত্ব মানেন না। তাঁহাদের মানব-সেবায় আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞায় আমরা অসংশয়ে এইরূপ মন্তব্য করিতে পারি—তোমরা যাহা খুশী তাহাই বলিতে পার, যেহেতু তোমাদের মুখের কোন অঙ্কুশ (ডাঙ্গস, হস্তীতাড়নের যন্ত্রবিশেষ) নাই। অঙ্কুশ থাকিলে কদাচ ঐরূপ কথা বলিতে সাহস করিতে না। ধর্ম্ম, ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তরে তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য এরূপ কথা বলিতেছি না এবং উহার বিরুদ্ধে তোমাদের সহিত কোন তর্কে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাও আমাদের নাই। জড়বাদ স্বীকার করিয়াই আমরা বলিতেছি যে, তোমাদের ঐরূপ উক্তি কি যুক্তিসঙ্গত? ধর্ম্মবাদিগণকে যে

কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া থাক, তার কারণ তাহারা অনেক যুক্তি-হীন জ্ঞানবহির্ভূত কার্য্য করিয়া থাকে। কুসংস্কারমুক্ত তোমরা কেন ধর্ম্মবাদিগণের ন্যায় যুক্তিহীন কার্য্য (যে সব কার্য্যের কোন ফল নাই) করিবে ও অপরকে করিতে বলিবে ?

ভাবিয়া দেখ, আত্মার অনিষ্টকর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই প্রকৃত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য। না জানিয়াই লোকে সর্পে, কণ্টকে, গর্ত্তে পদক্ষেপ করিয়া থাকে, জানিয়া কেহ করে কি ? যে প্রাণরক্ষার জন্য মানুষের এত প্রযত্ন, তোমরা জড়বাদী হইয়াও পরের জন্য সেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ! আরও দেখ, দুঃখ ভোগের জন্য কেহই দুঃখ স্বীকার করে না, সুখ ভোগের জন্যই করিয়া থাকে। পরিণামে শরীর সুগঠিত, স্বাস্থ্যসম্পন্ন নীরোগ না হইলে দুঃখজনক ব্যায়ামাদি কার্য্যে উন্মত্ত ভিন্ন অন্যে কে প্রবৃত্ত হইবে ?

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।

সাধারণত অজ্ঞান ব্যক্তিও বাঞ্ছিত ফল অপেক্ষা না করিয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না। এই প্রয়োজন আবার পুত্রের জন্য নয়, পত্নীর জন্য নয়, গ্রামের জন্য নয়, দশের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য নয়, নিজের জন্যই। উপনিষদে আছে—

"ন বারে পত্যুকামায়ঃ পতিপ্রিয়ো ভবতি, আত্মানস্তু কামায়ঃ পতিপ্রিয়ো ভবতি।"

যাজ্ঞবল্ক্যস্বপত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন—হে মৈত্রেয়ি ! পতির সুখের জন্য স্ত্রীলোকেরা পতিপ্রিয় হন না, আত্মার সুখের

জন্যই পতিপ্রিয় হইয়া থাকেন। পঞ্চদশী ঐ উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, যথা—

শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালে রুদতি তৎপিতা
চুম্বত্যেব ন সা প্রীতি বালার্থে স্বার্থএব সা।

বালকের মুখচুম্বনতৎপর পিতা শ্মশ্রুকণ্টকবিদ্ধ রোরুদ্যমান বালককে পরিত্যাগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বনই করিয়া থাকেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে সেই প্রীতি বালকের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যই। ধন, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়, স্বজন, সমাজ ও দেশের প্রতি যে প্রীতি, তাহা জন্য প্রীতি, সেই প্রীতির সহিত বিচ্ছেদ আছে। কিন্তু আত্মার প্রতি যে প্রীতি তাহা পরম প্রীতি ইহাই স্বাভাবিক; কোন কালে কোন অবস্থায় সেই প্রীতির সহিত বিচ্ছেদ নাই।

এমন কি, সাংসারিক ভার বহনে জ্বালাতন হইয়া লোকে যে উদ্বন্ধনে, বিষপানে কিংবা জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে, আর্য্যঋষিগণ তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহাও আত্মপ্রীতির জন্যই করিয়া থাকে। সেস্থলেও ত্যক্তার প্রতি কোন দ্বেষ হয় না; ত্যজ্য দেহাদির প্রতিই দ্বেষ হইয়া থাকে।

কোন জড়বাদী কাহাকেও সৎ কার্য্যে প্রেরণা দিতে পারেন না, অসৎ কার্য্যের জন্য কাহারও নিন্দাবাদ করিতেও পারেন না। যেহেতু তাহা তাঁহাদের স্ব-সিদ্ধান্তেরই বিরোধী। জগতে যত অসৎ কার্য্য আছে, জড়বাদে সেইগুলিই হইবে প্রকৃত জ্ঞানের কার্য্য। জড়বাদ সত্য হইলে পরার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহাপুরুষ

বলিয়া কথিত ব্যক্তিগণ স্মরণীয়, বন্দনীয় নন; নৃশংস মানববৈরি বলিয়া কুখ্যাত ব্যক্তিগণ ধিক্কৃত নয়, বরং প্রশংসনীয়। বন্ধুগণ! জড়বাদে সব ওলটপালট হইয়া যাইবে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জালিয়াতি, কালোবাজারি, লাম্পট্য, শাঠ্য, কাপট্য প্রভৃতি দোষগুলি মনুষ্যত্বের স্থান অধিকার করিবে এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য, সততা, সরলতা প্রভৃতি গুণগুলিই কুসংস্কার-প্রসূত বলিয়া গণ্য হইবে। এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। শকুনি বহু ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ত গো-ভাগাড়। তোমাদের অবস্থাও সেইরূপ। তোমাদের দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের উপদেশ দেওয়ার সারমর্ম্ম এই দাঁড়ায়—কর বিড়াল ব্যবসা, ফল—আঁচড় এবং কামড়।

জড়বাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—ভারতীয় জড়বাদী চার্ব্বাকগণ মনে করে, দেহই আত্মা। পৃথক্ পৃথক্ অথবা মিলিত বহিঃস্থ পৃথিব্যাদিভূতে চৈতন্য গুণ দৃষ্ট না হইলেও দেহাকারে পরিণত ভূতে তাহা দেখা যায়। তদনুসারে শরীরাকারে পরিণত ভূত পদার্থেই চৈতন্যের জন্ম সম্ভাবনা করা যায়। তাহারা বলে, বিজ্ঞানের নাম চৈতন্য, তাহা মদশক্তির ন্যায় দেহাকারে পরিণত ভূতনিচয় হইতেই উৎপন্ন হয়। তদ্বিশিষ্ট দেহই আত্মা বা পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। মরণের পর স্বর্গে থাকে নরকে যায় অথবা মুক্ত হয়, এরূপ কোন পৃথক চেতনাত্মা নাই। এই বাক্যের সাধক হেতু, যাহা তাহার বিদ্যমানতায় বিদ্যমান থাকে, অবিদ্যমানে অবিদ্যমান হয়, তাহা তাহার ধর্ম্ম বলিয়া

নির্দ্ধারিত আছে। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নিধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত, তেমনি প্রাণচেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি আত্ম-ধর্ম্ম বলিয়া আত্মবাদিগণের মধ্যে বিদিত। ঐ সকল ধর্ম্ম দেহেই অবস্থান করে, বাহিরে উহাদের সত্তা উপলব্ধ হয় না। তাহা না হওয়ায় ঐ সকল ধর্ম্মের দেহাতিরিক্ত ধর্ম্মী (আশ্রয়) সিদ্ধ হয় না। অতএব, দেহই আত্মা। দেহের ধ্বংস হইলে আত্মারও ধ্বংস হইবে।

এবিষয়ে কমিউনিষ্টগণ বলেন—"তত্ত্বের দিক থেকে কমিউনিজম যে দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত তা বিশ্ব-প্রকৃতিকেই আদি বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে এবং মনে করে যে ঐ বিশ্ব-প্রকৃতিরই ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে ক্রমশ প্রাণ ও চৈতন্যের উদ্ভব হয়েছে। ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতিক বস্তুতে তাই তার বিশ্বাস নেই।" সুতরাং উভয় মত একই রূপ। কিন্তু ভারতীয় জড়বাদী চার্ব্বাকগণ যেমনভাবে সত্য নিরূপণ করিয়াছে তার অনুরূপ কথাই বলিয়া থাকে; তার একটুও এদিক ওদিক হয় না। তারা ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকিতে চায়; তোমাদের মত দেশপ্রেমিক সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী নয়। তারা বলে—

যাবৎ জীবেৎ সুখং ভবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিনই সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। ঋণ করিলেই পরিশোধ করিতে হয়, এস্থলে ঋণের কিন্তু সেরূপ অর্থ নয়; ছলে, বলে,

কৌশলে যে কোন উপায়ে উত্তম উত্তম ভোগ্য দ্রব্য আহরণ করা। দেখ, ভারতীয় জড়বাদিগণের জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্তে ও তদনুরূপ কার্য্যে মিল আছে, যুক্তি আছে; তোমাদের নাই, একেবারেই উন্মত্ত-প্রলাপবৎ। অদ্ভুত মত এই জন্যই বলিয়াছি। ভারতে এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে কত প্রভেদ বিদেশী ভাবোদ্বুদ্ধ ব্যক্তিগণ একবার ভাবিয়া দেখুন!

বন্ধুগণ! কেন কেহ তোমাদের উপদেশে তার স্বভাবজাত কু-প্রবৃত্তিগুলি দমন করিয়া সৎ প্রবৃত্তি আনিবার চেষ্টা করিবে—যদি ধর্ম্ম নাই? কেন কেহ সুযোগ পাইলে কাহারও বুকে ছুরি দিয়া তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে না—যদি ধর্ম্ম নাই? কেন কেহ তোমাদের মূল্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ভুয়া দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া শত্রুপক্ষের মারাত্মক বুলেটের সম্মুখীন হইবে? দেশটা শত্রুর আগুনে কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গারণ করিয়া, জ্বলিয়া, পুড়িয়া শ্মশানে পরিণত হোক—তাতে তাহার কি? যদি সে বুঝিতে পারে দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার ফল কেবল যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। কেনই বা কেহ খাইতে পরিতে না দিয়া, মল-মূত্র পরিষ্কার না করিয়া বা না করাইয়া, বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, ভারস্বরূপ পিতা-মাতার মৃত্যু ত্বরান্বিত করিয়া কষ্টকর সেবা-শুশ্রূষার দায় হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে না? যদি সেজন্য তাহাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়?

এমন লোকেরও অভাব নাই, যারা ধর্ম্মে ও কমিউনিজমে সমান ভাবেই আগ্রহশীল। তাহাদের যুক্তি—ধর্ম্ম ধর্ম্ম—

রাজনীতি রাজনীতি। অর্থাৎ ধর্ম্ম আলোচনার সময়ে রাজনীতির স্থান নাই এবং রাজনীতি আলোচনার সময়ে ধর্ম্মের স্থান নাই। তারা জানে না, রাজনীতি যদি মানুষের মঙ্গলদায়ক হয়; তবে ধর্ম্মবাদকে অবলম্বন করিয়াই তার সার্থকতা, জড়বাদকে অবলম্বন করিয়া নয়। কেহ কেহ আবার কমিউনিজম্-বাদে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বীজ নিহিত আছে দেখিতে পাইয়াছে। এবং "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" চণ্ডীদাসের এই পদটি তাদের মতের সমর্থকরূপে আবৃত্তি করিয়া থাকে। তাদের এই সব কথায় হাসিব কি কাঁদিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। আত্মার অমরত্ববাদী চণ্ডীদাস কি জড়বাদের অনুকূলে ঐ পদটি রচনা করিয়াছেন, না করিতে পারেন? মানুষই চরম জ্ঞান লাভের অধিকারী, অন্য প্রাণী নয়, ইহা অধিকার-নির্ণয় প্রসঙ্গে জৈমিনী মুনি বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইহা লক্ষ্য করিয়াই চণ্ডীদাস উক্ত পদটি রচনা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

কমিউনিজমের শেষ লক্ষ্য কি? এ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নোক্তরূপ। "মানুষ শুধু পেট পুরে খাবে, ভালো জামা কাপড় পরবে, দামী মোটর গাড়ি চড়বে, নানারকম ভোগবিলাসে আকণ্ঠ ডুবে থাকবে"—কমিউনিজম কি মানুষের এই ভবিষ্যৎই কল্পনা করে? মনুষ্যত্বের কি এর থেকে আর কোনো মহত্তর আদর্শ নেই কমিউনিজমের দৃষ্টিতে? কমিউনিজমে ধর্ম্মের স্থান কোথায়?

এই সব প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন—“আমরা আগেই দেখেছি মানুষের পক্ষে খাওয়া-পরা, মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজা, এসব হচ্ছে একেবারে গোড়ার কথা। যেহেতু গোড়ার কথা, তাই এসব বাদ দিয়ে তার পক্ষে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চ্চা বা অন্তরলোকের নিগূঢ়তত্ত্বের সন্ধান কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু এসব গোড়ার কথাই—মোটেই শেষ কথা নয়, তাই মানুষের পক্ষে স্থূল বৈষয়িকতা কিছুতেই তার জীবনের পরমার্থ হতে পারে না। বরঞ্চ কমিউনিজম চিন্তা-ভাবনা বা মনুষ্যত্ব-অর্জ্জনের পক্ষে অন্যান্য দিকগুলির উপর খুব বেশী মুল্য আরোপ করে।...তাছাড়া সবদেশেই কমিউনিজমে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা দেশবাসী ও বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত জীবনে ভোগ-বিলাসকে তুচ্ছ করেছেন অকাতরে, তাঁদের আদর্শের জন্য দুঃখকষ্ট-বরণ, এমন কি প্রয়োজন হলে চরম আত্মদানে পিছপা হন নি কখনো।”

তাঁদের এইরূপ সৃষ্টিছাড়া স্বার্থত্যাগ ও ভোগবিলাসে আজগুবি বৈরাগ্যের উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্বার্থপর ধর্ম্মবাদিগণ এরূপ কিছু করেন না। তাঁরা সাংসারিক ভোগবিলাস বিষবৎ বর্জ্জন করেন আর-একটা বড় রকমের ভোগবিলাস লক্ষ্য করিয়া; তাহা কল্পিতই হোক আর যাই হোক, তবে যুক্তিসঙ্গত। সে ভোগবিলাসের তুলনা নাই, শেষ নাই, সীমা নাই, অতুল্য, অনন্ত, অসীম সে লক্ষ্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট ‘অশ্বডিম্ব’-শব্দবৎ অনর্থক বিপর্য্যয়

জ্ঞানের কারণ নয়। তাঁদের পার্থিব পদার্থে বৈরাগ্য এইরূপ—

যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে না মান মণি
তাহার খানিক
মাগি আমি নত শিরে, এত বলি নদী নীরে
ফেলিল মাণিক।

তাঁরা আরও বলেন যে—"ব্যবহারিক দিক থেকে কমিউনিজম প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্মমত অনুসরণের পূর্ণ অধিকারে বিশ্বাসী এবং এক্ষেত্রে প্রকাশ্য বা গোপন যে কোনো রকম জবরদস্তির ঘোরতর বিরোধী। কারণ কমিউনিজমে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের যেমন ঈশ্বর বা ধর্ম্ম না মানার অধিকার কারো কেড়ে নেওয়া উচিত নয়, তেমনই আবার ধর্ম্মবিশ্বাসীদের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মমত পোষণের ও পালনের অধিকারকে কোনোমতেই ক্ষুন্ন হতে দেওয়া চলে না। ধর্ম্মবিশ্বাসের মত বহুদিনের ও বহুপ্রচলিত গভীর বিশ্বাসের উপরে কোনো হস্তক্ষেপকে তাই কমিউনিজমে মানুষের প্রাথমিক অধিকার হরণের সামিল মনে করে।"

ধর্ম্মবাদিগণকে ঐরূপ আশ্বাসও দিয়াছেন। কিন্তু "এ ব্যাপারটি কমিউনিজমের নজর এড়ায়না যে যদিও ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে বহু মূল্যবান মানবিক নীতি জড়িত, তবু প্রচলিত ধর্ম্মমত অনেক সময়ে শোষক শ্রেণীর পোষকতা করে, শোষিত মানুষের শ্রেণীচেতনা ও বিদ্রোহী মনোভাবকে অসার করে দেবার

চেষ্টা করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে”—এমন কথাও ত বলিয়াছেন।

বিশেষতঃ ভারতবর্ষ একটি আজগুবি দেশ। এখানে যজ্ঞ-কার্য্য ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবেই বিবেচিত ও পালিত হয়। ঘৃতাদি অনেক স্বাস্থ্যকর ও বহুমূল্য পদার্থ যজ্ঞানলে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে জঘন্য রকমের অপচয় ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। যেখানে মানুষ পেট পুরিয়া খাইতে পায়না, চারিদিকেই “হা অন্ন! হা অন্ন” রব; সেই ভারতেই অষ্টগ্রহসমাবেশে মঙ্গলকামনায় একস্থানেই চৌদ্দ লক্ষ্য টাকার সামগ্রী অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া ধর্ম্মের নামে জয়ধ্বনি ঘোষিত হইয়াছে। এই সবও কি স্বীকার করিয়া লইবে না, এ বিষয়ে হাঁ না যা বলিবে তাহাতেই দোষ হইবে। হাঁ বলিলে যাহা দূর করিবার জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর সেই অবিশ্বাস্য গোঁড়ামির নিকট আত্মসমর্পণ! না, বলিলে ধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণের সহিত সন্ধিসর্ত্ত-ভঙ্গ।

তোমরা যে বলিয়াছ—“এখনকার সমাজের অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের উচ্চতর ধাপগুলিতে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছেনা ঠিক এই কারণেই যে, অভাব, অনটন, শোষন, ও অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রভৃতি ব্যাপারগুলি তাঁদের জীবনকে বিড়ম্বিত করছে পদে পদেই। এই বিড়ম্বনাগুলিকে সমাজ থেকে চিরতরে নির্ব্বাসন দিতে পারলে, তবেই মানুষ স্থূল বৈষয়িক বাধ্যবাধকতার রাজ্য থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে সত্যকার

মুক্তির রাজ্যে।” কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে—কার্ল মার্ক্‌স্‌, লেনিন প্রভৃতি মানবদরদিগণ ও যাঁরা মুক্তি-রাজ্যে গমনের অর্দ্ধ পথেই শোষক শ্রেণীর ক্রুদ্ধখড়্গে আত্মদান করিয়াছেন, তাঁরা এখন কোথায়? সেস্থান এখান হইতে কত দূর? কুসংরাস্কাচ্ছন্ন ধর্ম্মবাদিগণ ত বলে, জড়বাদী মতে শরীর ধ্বংস হইলে আত্মারও ধ্বংস হয়; যথা হরিদ্রা ও পীতবর্ণ।

মানুষের ধর্ম্মপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে তাঁরা যজ্ঞকার্য্য বৈধরূপেই গ্রহণ করিবেন। একথা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা বলিব, কমিউনিজম যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। “কোন জড়বাদী কাহাকেও সৎকার্য্যে প্রেরণা দিতে পারেন না, অসৎকার্য্যের জন্য কাহারও নিন্দাবাদ করিতেও পারেন না” এইরূপ যে বলিয়াছি, ইহা হইতে বিরত থাকিবার কোন কারণ দেখিতে পাই নাই।

ধর্ম্মই জগৎকে সুন্দর স্বর্গে পরিণত করিয়াছে ও করিবে। কমিউনিজম কেবল দেশটাকে ধ্বংসের পথে শ্মশানের দিকেই লইয়া যাইতেছে। যেখানে ধর্ম্মের নামে অঘটন ঘটিতে দেখিয়াছ তাহা প্রচ্ছন্ন জড়বাদেই জানিবে। লম্পট, শঠ, প্রবঞ্চক হইলেও ধর্ম্মবাদিগণই “এই কর সেই কর” উপদেশ দিতে পারেন। কারণ তাঁহারা কাহাকেও ফলবর্জ্জিত কর্ম্ম করিতে বলেন নাই। সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির হইলেও তোমরা তা পারনা যেহেতু তোমাদের বক্তব্যের পশ্চাতে কোন যুক্তিই নাই। গীতায় আছে—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

হে অর্জ্জুন! তুমি যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হও, তাহা হইলে স্বর্গ সুখ ভোগ করিবে। যদি জয়লাভ কর তবে পৃথিবী ভোগ করিবে।

গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে জানা যায়, ইহাতে ফল বেশীই হয়।

ধর্ম্মবাদিগণ বলেন,—"দাতারং কৃপণং মন্যে", দাতাকে কৃপণ বলিয়া মনে করিবে। কারণ দাতা দরিদ্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দরিদ্রের উপকার করে না, নিজেরই উপকার করে। পরজন্মে সে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদে আসলে পাইয়া থাকে। কমিউনিষ্টগণ ঐরূপ কথা বলিবেন কি, তাঁহারা ত জন্মান্তরেই মানেন না এবং ইহজন্মে ত উপকারীকে মাঠে মারা যাইতেও দেখা যায়।

এমন কি ধর্ম্মবাদিগণ যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, সৎকার্য্যের ইষ্টকারিতা ও অসৎ কার্য্যের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। কারণ আকস্মিক উৎপত্তিপক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই ব্যর্থ। এপক্ষে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যগম দোষ আগমন করে। অর্থাৎ করিয়াও ফল না পাওয়া, না করিয়াও ফল ভোগ—এই দুইটি দোষ সৎকর্ম্ম করার ও অসৎ কর্ম্ম না করার প্রতিবন্ধক স্বরূপ। সাধুকেও কষ্টভোগ করিতে এবং অসাধুকে সুখ ভোগ করিতে দেখা যায়। সুতরাং এরূপ মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে; স্বর্গ নরক থাকে থাকুক—তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু যখন সদসৎ কর্ম্মব্যতিরেকেও ধনী-দরিদ্রের গৃহে অঙ্গ-

সৌষ্ঠবসম্পন্ন সুন্দররূপে কিংবা অন্ধ, খঞ্জ; বধির, বিকলাঙ্গরূপে জন্ম হয়, তখন সদসৎ কর্ম্ম স্বর্গ-নরকের কারণ হইবার প্রমাণ কোথায়? অনিয়মেই ত হইতে পারে। সুতরাং সৎ কর্ম্ম করার কোন প্রশ্নই উঠে না। অতএব, ঐসব প্রশ্নের নিরাসক অখণ্ডনীয় জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে।

ধর্ম্ম কখনও প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয় না; অথচ উহাকে অস্বীকার করাও চলে না। ধর্ম্ম মননের দ্বারাই পাওয়া যায়। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ মননের প্রভাবেই ধর্ম্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি বা রুচি দেখিয়া তার মূল কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুমান হয়। অর্থাৎ ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানুষ সৎ কর্ম্মে, এবং অধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহা সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া আছে। কম বেশী সকল প্রাণীতেই ধর্ম্ম বিদ্যমান। ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যই জগতের ধ্বংসের কারণ। আর্য্যঋষিগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম জড় পদার্থ; জড় কাহারও ইষ্টানিষ্ট কিছুই করিতে পারে না; সবার উপরে এক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ চেতনতত্ত্ব, তাঁহাকে ঈশ্বরই বল আর যাহাই বল, সকল জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে ভালমন্দ ফল দান করিয়া থাকেন।

জড়বাদিগণ রাষ্ট্রপরিচালনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন, আশ্চর্য্যজনক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় মানবমনে বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারেন; এবং লক্ষ লক্ষ লোক জড়বাদ অনুসরণ

করিলেও ইহা স্থির নিশ্চিত যে, একদিন না একদিন তাঁহাদিগকে কুসংস্কার-প্রসূত তথাকথিত ধর্ম্মবাদের নিকট নতিস্বীকার করিতে হইবেই হইবে।

যদি তোমাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়া, এমন কি অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত মনুষ্যসমাজকে মুক্ত করিবার প্রবল আগ্রহ থাকে ; তবে তোমাদের সেই সৎ ইচ্ছায় প্রেরণা যোগাইবার মূল উৎস কি? খুঁজিয়া দেখিলে যাহা পাইবে তাহাই ধর্ম্ম। যদি না পাও তবে "যাবৎ জীবেৎ সুখং ভবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অর্থাৎ যে কোন উপায়ে ভোগ-বিলাসে ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা কর ; উদ্ভট বৈরাগী সাজিও না।

হয় মৎকথিত বাক্যগুলি উন্মত্ত প্রলাপবৎ প্রতিপন্ন করুন ; না হয় কমিউনিজম বিষবৎ বর্জ্জন করুন। যুক্তির ভিত্তিতে আমার মত গ্রহণ ও বর্জ্জন, দুইটির মধ্যে যে কোন একটিতেই সন্তুষ্ট হইব, ইহা অবগত হইবার জন্য আমি দেশের চিন্তানায়ক ব্যক্তিবর্গের এমন কি কমিউনিষ্টগণের বিবেকের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

কমিউনিজম সম্বন্ধে বলিতে বলিতে অনেক কথাই বলা হইল। এখন আমরা আবার মুল বিষয়েরই আলোচনা করিব।

শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে; উপনিষদ্ ও গীতাভাষ্যে ও অন্যান্য রচনায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। লৌকিক শিষ্টাচারের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছে। লৌকিক আচার রক্ষার্থ তিনি যে জননীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ

না লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই, ইহা তাঁর জীবন বৃত্তান্তে বর্ণনা করিয়াছি। বেদবাক্যের কতক সার্থক কতক নিরর্থক ইহা তিনি মনে করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন অধিকারী ভেদে সমস্ত বেদবাক্যই প্রমাণ। তাঁর গীতাভাষ্যে আছে,—

কর্ম্মকাণ্ডের বিধায়ক বেদভাগ একেবারেই প্রমাণ নয়, তাহা নহে। ঐ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদক বেদভাগ (মানবের স্বভাবজাত বাহ্যবিষয়ক) পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবৃত্তিকে নিরোধ করে, এবং সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর অপূর্ব্ব অর্থে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া, ক্রমে ক্রমে বাহ্যবিষয় হইতে আন্তর বিষয়ে প্রবৃত্তির উৎপাদন দ্বারা পরমাত্মা বিষয়ে আমাদের প্রবৃত্তি যাহাতে অভিমুখ হয় তাহাই করিয়া দেয়। এইপ্রকার উপায় শেষে মিথ্যা হইলেও যেহেতু ইহার ফল মিথ্যা নহে, সেই কারণে ইহাকেও সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। লোকমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে; বালক অথবা উন্মত্তকে দুগ্ধ প্রভৃতি পান করাইতে হইলে বলিতে হয় ইহা খাইলে তোমার চূড়াটি বড় হইবে। আত্মজ্ঞানের উদয় যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত দেহ প্রভৃতিতে আত্মাভিমানের ফল স্বরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি তাহা সকলের নিকটই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। অন্যত্র আছে,—

গৌণমিথাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্র দেহাদিবাধনাৎ।
সদ্‌ব্রহ্মাত্মাঽহমিত্যেবংবোধে কার্য্যং কথং ভবেৎ॥

অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্‌প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ।
অন্বিষ্টস্যাৎ প্রমাতৈবং পাপ্মদোষাদিবর্জ্জিতঃ॥
দেহাত্মপ্রত্যয়োযদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥

ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়াছেন, "আমি কেবল সৎস্বরূপ ও পুর্ণ" এতদ্রূপ বোধ জন্মিলে, পুত্রাদি ও দেহাদি বাধিত হওয়ায় গৌণাত্মা ও মিথ্যাত্মা বাধিত হইয়া যায়। (পুত্র কলত্রাদির দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমি বড় দুঃখিত এইরূপ অহং প্রত্যয়কে গৌণাত্মা এবং আমি মানুষ, আমি কর্ত্তা ইত্যাদিবিধ অহং জ্ঞানকে মিথ্যাত্মা বলে। এই দ্বিবিধ আত্মাই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের কারণ।) এই দ্বিবিধ আত্মা বাধিত হইলে তখন আর কি প্রকারে কার্য্য—বিধি, নিষেধ ব্যবহার হইবে? শ্রুতিতে যিনি অজর, অমর, অশোক, অদুঃখ আত্মা জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই জ্ঞাতব্য আত্ম বিজ্ঞাত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই অজ্ঞানপ্রযুক্ত তাদৃশ আত্মার প্রমাতৃত্ব হইয়া থাকে; জ্ঞাত হওয়ার পর সেই প্রমাতাই পাপাদি-রহিত পরমাত্মা হইয়া যায়। দেহাত্মজ্ঞান কল্পিত অর্থাৎ ভ্রম হইলেও যেমন জ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারও তেমনি আত্মজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়।

অদ্বৈতবাদী শঙ্কর নিজে কালাপাহাড় সাজেন নাই এবং কাহাকেও কালাপাহাড় সাজিতে বলেন নাই। তিনিই পঞ্চ-দেবতার উপাসনা পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন।

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।

এই বিষ্ণুভজন স্তোত্রে, এবং

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদ কমলে॥

এই গঙ্গাস্তোত্রে, এবং

গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।

এই গুরু এবং বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসপরায়ণতায়, এবং

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

এই সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে তাঁহার অভিমত অতি সুন্দর ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতাও যথেচ্ছাচারিতা প্রবেশের তিলমাত্রও অবকাশ আছে কি?

মানবহৃদয়বিজ্ঞানে নিপুণ শঙ্কর সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং নস্তমঃ।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

যদিও ভেদ-বুদ্ধি নষ্ট হইলে সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ থাকে না, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না। সেইরূপ হে অখিলনাথ! তোমাতে আমাতে কোন ভেদ না থাকিলেও আমি তোমারি, তুমি আমার এ কথা বলিতে পারিনা।

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ।
শিষ্যানাং কথিতোভ্যুপদেশঃ॥
যেষাং নৈষং করোতি বিবেকং।
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্॥

ষোলটি শ্লোকে শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদত্ত হইল; ইহাতে যদি জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর কে জ্ঞান দিতে পারে?

শঙ্কর ব্যতীত আর কে এমন নিঃসংশয়ে, দৃঢ়তার সহিত উপদেশ দিতে পারেন? তাঁহার মোহমুদ্গর বাস্তবিকই মোহ-বিনাশের পক্ষে মুদ্গরসদৃশ। জটিল দার্শনিক তত্ত্ব ও তাঁহার যাদুকরী লেখনীস্পর্শে কাব্য অপেক্ষাও মধুর ভাবে শ্রোতার শ্রবণ-মন পরিতৃপ্ত করে। তাঁহার ভাষ্য ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা এখন তাঁর মহান ভাব শ্রদ্ধা হারাইয়া ঘরের অমূল্য স্নিগ্ধরত্ন জ্যোতিঃ ত্যাগ করিয়া বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ধ্বংসকর কমিউনিজম আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছি।

অদ্বৈতমতে পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়িক, অসৎ, অবস্তু। কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় তত্ত্ব কিছুই নাই। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র সমন্বিত এই বিশাল জগৎ, শুক্তিরজতের ন্যায়; মরীচিকার জলের ন্যায়; রজ্জু-সর্পের ন্যায় একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর মায়া জন্য বিবর্ত্ত;

ইন্দ্রজালের মত সত্যব্রহ্মে অধ্যস্ত ভ্রমমাত্র। ব্রহ্মেরই চিত্তময়ী লীলার বিলাস সঙ্কল্পমাত্র সিদ্ধ অবস্তু।

শাস্ত্র; যুক্তি; অনুভব এই তিন প্রকার অনুসন্ধানে জানা যায় যে, যাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধীন, তাহাতে তাহা কল্পিত। যেমন তরঙ্গ ও বদ্বুদ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত; অর্থাৎ সে সকলের সত্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে। তেমনি, এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তার অধীন। এতদ্দৃষ্টে স্থির করা যায়; দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মচৈতন্যে কল্পিত। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা নাই।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ॥

মায়াকে প্রকৃতি ও তদুপহিত চৈতন্যকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মায়াবী মহেশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মই এই দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির কারণ। শ্বেতাশ্বতর শাখাধ্যায়িগণ ইহাই বলেন।

নিম্নোক্ত বর্ণনাদ্বারা এই তত্ত্বটি আরও সুগম হইবে,—

যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদি প্রয়োগে ক্ষুভ্যমান্ মায়ার দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃজন করে; সেইরূপ মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছা দ্বারা জগৎ সৃজন করেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই শাস্ত্রে মায়া, প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবেশ্বর বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্টসত্ত্বপ্রাবল্যে

মায়া এবং মলিনসত্ত্বপ্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ায় উপহিত ঈশ্বর আর অবিদ্যায় উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। মায়া এক, সেজন্য ঈশ্বরও এক। মালিন্যের তারতম্যানুসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা—সুর, অসুর, মানুষ, পশু প্রভৃতি। মায়ায় জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেইজন্য তদুপহিত চৈতন্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অল্পতাবশতঃ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের জীব হওয়া কৌন্তেয় কর্ণের রাধেয় হওয়ার অনুরূপ। অপিচ, যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, ও তত্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনি ব্রহ্ম ও সুর, অসুর, মানুষ পশু প্রভৃতি দেহে জীব, আর তত্ত্যাগে ব্রহ্ম।

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥
কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।
পিতা পিতামহশ্চৈকং পুত্রপৌত্রং যথা প্রতি॥
পুত্রাদেব বিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতমহঃ
তদবন্নেশো নাপি জীবশক্তিকোষাবিবক্ষণে॥

সকল বস্তুর নিয়ামিকা যে মায়াশক্তি সেই শক্তি সংযোগে ব্রহ্মেরই ঈশ্বরত্ব, এবং অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও ও আনন্দময় কোষরূপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মেরই জীবত্ব। যেমন কোন ব্যক্তি পুত্র-পৌত্রাদি অপেক্ষা করিয়া পিতা পিতামহ প্রভৃতি নানা জ্ঞানের বিষয় হন, কিন্তু পুত্র

পৌত্রাদি নিরপেক্ষ জ্ঞানেব্যক্তি মাত্র; তেমনি ব্রহ্মও শক্তিকোষ-নিরপেক্ষ জ্ঞানে ঈশ্বর ও জীব প্রভৃতি কিছুই নহেন, তখন তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম।

অজ্ঞ জীব আত্মকল্পিতভাব সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ। যদ্রূপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ স্বীয় অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাও স্ব-স্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই অজ্ঞ জীব স্বকল্পিত দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞাত নহে। বিচারাত্মক শ্রবণ মননাদির দ্বারা অজ্ঞান-মালিন্য পরিমার্জ্জিত হইলেই জীব বুঝিতে পারে—আমি পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও সত্য, অপর সমস্ত আমাতে ও আমারি কল্পিত।

তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ। বামদেব ঋষি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পর, "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম" এইরূপ জানিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন।

গীতায় আছে;—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

সমদর্শী যোগিগণ আত্মাকে সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আত্মায় সন্দর্শন করেন।

আত্মা আকাশের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন, পূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ ও চেতন। ইহার পার্শ্বচর অজ্ঞান নামক দোষ ইহাতে প্রথমে অহং প্রতিভাস উত্থাপন করে। এবং অহং প্রতিভাস উৎপন্ন হওয়াতেই

ক্রমে অসংখ্য দ্বৈত প্রতিভাস উৎপন্ন হয়। জীব বস্তুতঃ পরম্, পরন্তু পরম্ হইয়াও তিনি অপরম্, অর্থাৎ প্রাদেশিক পরিচ্ছিন্ন জীব হইয়া আছেন। এবং জীবভাবপ্রাপ্ত হওয়াতেই বৃথা কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সংসারজ্বালা ভোগ করিতেছেন। জননী অপেক্ষাও অধিকহিতৈষিণী শ্রুতি তাহা বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদক "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করিয়াছেন।

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় অহং বৃত্তি অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে। সংসারকালের অহংজ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। অজ্ঞানকালের অহং জ্ঞান কখন মন কখনও ইন্দ্রিয় কখনও বা শরীর কখনও বা বাহ্য পুত্রমিত্রাদি অবলম্বন করতঃ অবস্থান করে, পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয় না। সুতরাং অহংজ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা সন্ধিগ্ধের ন্যায় অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। এই অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তাহা তত্ত্বজ্ঞান আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। জননীর ন্যায় হিতাভিলাষিণী শ্রুতি "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বার জীবের সংসারভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। শ্রবণে অকৃতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অধিকারিতা লাভের জন্য চিত্তশুদ্ধিকারক উপাসনা প্রয়োজন। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি বেদোক্ত অনুষ্ঠানে কিছুদিন

রত থাকিলেই শ্রবণাদি কার্য্যে অধিকারিতা জন্মে। মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধক অভাবপ্রাপ্ত হয়, এবং প্রতিবন্ধক অভাবপ্রাপ্ত হইলেই শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান (অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অনুভব) আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা অহংবৃত্তি ব্রহ্ম দর্শন করায়, করাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তখন আর অহং থাকে না, সুতরাং ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বা মোক্ষ জন্মে।

শ্রোতার চিত্তে অহংবৃত্তি উদিত করাইবার নিমিত্ত শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়—এ লক্ষণ স্বরূপ সন্নিবিষ্ট। "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে; যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌, ব্রহ্ম।" যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয় তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে। এ লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ। কিন্তু জগৎ কারণ হইলেও ব্রহ্ম সাংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশেষিকের পরমাণুর ন্যায় পারিণামী ও আরম্ভক কারণ নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন; সুতরাং অভিন্ন নিমিত্তোপাদান বিবর্ত্তীকারণ। অভিন্ন নিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড়সা), লূতা সৃজ্যমান সুত্রের প্রতি স্বচৈতন্য প্রাধান্যে নিমিত্তকারণ এবং স্বশরীর প্রাধান্যে উপাদান কারণ। লূতা যে সূত্র সৃষ্টি করে তাহার উপাদান সে অন্য কোথাও হইতে আনে না; তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে।

সূত্রকার ভগবান্ ব্যাস যে মায়াবাদ সমর্থন করেন, তাহা "আত্মানিচৈবং বিচিত্রাশ্চহি" ব্র. সূ. ২।১।২৮ সূত্রে বুঝিতে পারা যায়। বাচষ্পতিমিশ্র বলেন এই সূত্রে মায়াবাদ সুস্পষ্ট হইয়াছে। সূত্রের ভাবার্থ এই যে,—ব্রহ্ম এক, অসহায়, তাঁহাতে অনেকাকার সৃষ্টি হয়, অথচ তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয়না। ইহা কেন হয়? কি প্রকারে হয়? ইহা লইয়া বিবাদ করিও না। স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মা এক, স্বপ্নকালে তাঁহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয়, অথচ আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুতই থাকে। স্বাপ্নিক বিচিত্র সৃষ্টি শ্রুতিতেও পঠিত হইয়াছে। "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগা ন পথঃ সৃজতে।" সেখানে (স্বপ্নস্থানে) রথ নাই, রথ বাহী অশ্বও নাই, পথও নাই। স্বপ্ন দ্রষ্টাই রথ, অশ্ব ও পথ সৃজন করেন। লোকমধ্যেও ঐন্দ্রজালিক প্রভৃতিতে দেখা যায় যে, তাহাদের স্বরূপ বিনষ্ট হয় না; অথচ হস্তী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি অদ্বয় ব্রহ্মেও বিবিধাকার সৃষ্টি হয়, অথচ ব্রহ্মের স্বরূপ অক্ষুণ্ণই থাকে। (শঙ্কর ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব এবং জগতের সত্যতা প্রমাণে চিন্তামণির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে,—

অবিচিন্ত্য শক্তিযুত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।

তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপি মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।

এইরূপ দৃষ্টান্তে প্রশ্ন উঠিবে, ইহা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে? কারণ চিন্তামণি নামক পদার্থটি আছে কিনা সে সম্বন্ধে শুধু অজ্ঞ জনসাধারণের নয়, যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাঁহাদেরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা সন্দিগ্ধ তাহা কি দৃষ্টান্ত হইতে পারে? দৃষ্ট বস্তুর সাধর্ম্ম্য অনুসারে অদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে সত্য; কিন্তু এইরূপ চিন্তামণি নামক বস্তুটি কেহ কখনও দেখেন নাই। দার্ষ্টান্তিক জগৎকারণ ব্রহ্মও অজ্ঞাত, তৎবোধনার্থ প্রবৃত্ত চিন্তামণি নামক দৃষ্টান্তটিও অজ্ঞাত হইলে তদ্দ্বারা জগৎ কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব।

চিন্তামণির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও, চিন্তামণি-প্রসূত রত্নরাশি চিন্তামণিতে লয়প্রাপ্ত না হওয়ায় (যেহেতু সত্যের লয় নাই) এবং সৃষ্টিশক্তি থাকায় ব্রহ্মেও নূতন নূতন জগতের উৎপত্তি মানিয়া লইতে হয়। এবং তাহাতে সৃষ্টিতত্ত্বের সামঞ্জস্যই থাকে না। শ্রুতিতে আছে,—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।

বিধাতা এই কল্পেও পূর্ব্বকল্পানুরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ কল্পনা করিলেন অর্থাৎ উৎপাদন করিলেন।

যথার্ত্তবৃতুলিঙ্গানি নানারূপানি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথাভাবাযুগাদিষু।

যেমন বিলুপ্ত ঋতুচিহ্নসকল পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয় ঠিক, পূর্ব্বতন বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন (পুষ্পপত্রাদির উদ্গম) পরবর্ত্তী বসন্তাদিতে প্রকাশ পায়, প্রলয়ের পরযুগারম্ভকালেও পূর্ব্ব-কল্পীয় পদার্থ সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং কোনদিকেই দৃষ্টান্তটির সার্থকতা নাই।

অধুনাতন কালে আশ্চর্য্যজনক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াকে যাঁহারা অভূতপূর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন; তাঁহাদের সে ধারণা ভ্রান্ত। কারণ নূতন বলিতে কিছুই নাই; সকলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। পূর্ব্বে যাহা হয় নাই, তাহা হইতেই পারে না, হইবেও না। জড়ই যদি এ সকলের কারণ হয় তাহা কি এই সব আবিষ্কার করিবার জন্য এই বিংশ শতাব্দীটি (যেহেতু জড়ের উন্নত শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণকে প্রসব করিবার সামর্থ্য আছে) অপেক্ষা করিয়া ছিল? ইহাই কি যুক্তিসিদ্ধ? জ্ঞান-গরিমায় গরিয়সী কত বিংশ শতাব্দী কত, বৈজ্ঞানিক, কত রাজনীতিক, কত ধর্ম্মপ্রচারক; কত কুখ্যাত নরঘাতক, তাঁহাদের আধারসহ এই পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ; নক্ষত্ররাজি আকাশ (ব্রহ্ম) সাগরে কতবার যে তরঙ্গরূপে উঠিয়াছে, পড়িয়াছে, কত বার উঠিবে পড়িবে তাহার সংখ্যা নাই। ইহাই ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। সুস্থ চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অসঙ্গত বলিয়াও বোধ হইবে না।

কোন কোন বৈদান্তিক বলেন—অভেদ তত্ত্বমসি বাক্যের মুখ্যার্থ নহে, ঔপচারিক ; লোকে যেমন অমাত্যকেও রাজা বলে, তেমনি শ্রুতি চৈতন্যাংশে ব্রহ্মস্বভাবের সাদৃশ্য আছে দেখিয়া জীবকে ও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অথবা জীব ব্রহ্মের অংশ, অথবা জীব ব্রহ্মের সেবক, তৎকারণে শ্রুতি জীবকে ব্রহ্ম বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সাদৃশ্য থাকিলে সদৃশ বস্তুকে তৎস্বরূপ বলা যায়। সুতরাং অংশাশীভাব; স্বামীভৃত্যভাব, অথবা প্রভুভৃত্যভাব থাকিলে ও ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। হয়ত শ্রুতির অভিপ্রায় অংশাশীভাব অথবা প্রভুভৃত্যভাব। শঙ্কর বলেন—প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব তাহা নহে। অংশাশীভাব অথবা প্রভুভৃত্যভাব অভিপ্রায়ে ঐ সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। কারণ শ্রুতিসন্দর্ভের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান ও তাৎপর্য্য বিচার করিলে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অভেদ অর্থ গৌণ নহে ; প্রত্যুত মুখ্য। বিবেচনা কর, আকাশের ন্যায় নিরবয়ব পরমেশ্বরের অংশ নিতান্ত অসম্ভব। জীবগণ ঈশ্বরাংশ একথা সত্য হইলে ঈশ্বর অংশী একথাও সত্য হইবে, কিন্তু তাহা অযুক্ত। বিবেচনা কর অংশীও সাবয়ব সমান কথা। এবং সাবয়ব পদার্থ যেজন্যত্ব, বিনাশিত্বাদি দ্বারা প্রলিপ্ত তাহা সকলেই বিদিত আছেন। গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—

নাকাশস্যঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনো সদাজীবো বিকারাবয়বৌ তথা॥

যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার অথবা অংশ নহে

(যেহেতু আকাশ অখণ্ড বস্তু)। সেইরূপ জীবও ব্রহ্মের বিকার অথবা অংশ নহে। বিবেচনা কর, যখন আকাশই বিভক্ত হয় না, তখন আকাশের কারণ পরমসূক্ষ্ম ব্রহ্ম কি বিভক্ত হইতে পারেন ? গীতায় আছে,—

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সকল ভূতে অবিভক্তভাবে থাকিলেও যেন বিভক্তের মত অবস্থিত আছেন। দেখ, জীব প্রতি শরীরে বিভিন্ন হইলে বিভক্তের মত বলিবেন কেন ?

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥

যেমন এক সূর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশ করেন, সেইরূপ একই ক্ষেত্রী (আত্মা) সকল ক্ষেত্র (দেহ) প্রকাশ করেন।

শ্রুতিতে আছে—

যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
অপোভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা ॥

যেমন, জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হন (উপাধিকৃত তাঁহার এই ভেদ), সেইরূপ দ্যুতিমান্ জন্মরহিত পরমাত্মাও বহুরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন।

গীতায় আছে,—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥

যে জ্ঞানের দ্বারা পরস্পর-বিভক্ত সকল ভূতে এক অবিনাশী অবিভক্ত "ভাব" (এখানে ভাব শব্দের অর্থ আত্মস্বরূপ বস্তু, যে-বস্তু আকাশের ন্যায় এক ও নিরন্তর) দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে। এই সাত্ত্বিক জ্ঞানই অদ্বৈতাত্মদর্শন বা সম্যক্‌ দর্শন এবং ইহা সাক্ষাৎ সংসারের উচ্ছেদক।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথক্‌বিধান্‌।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌॥

প্রতি দেহেই ভিন্ন ভিন্ন নানা অবস্থাসম্পন্ন বহু আত্মা বিদ্যমান রহিয়াছে ; ঐসব আত্মার স্বরূপ ও লক্ষণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ; এইভাবে যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে বুঝিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানকে রাজসজ্ঞান বলিয়া জানিবে। এই রাজসজ্ঞান বা দ্বৈত জ্ঞানই সংসারের কারণ। শ্রুতি বলেন—

"মৃত্যোস মৃত্যুমাপ্নোতি যঃ ইহ নানেব পশ্যতি।"

যে আত্মায় নানাত্ব দর্শন করে সে মৃত্যুর পরও মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—অর্থাৎ সে পুনঃ পুনঃ এই যন্ত্রণাময় সংসারে আবর্ত্তন করিয়া থাকে।

জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য) নাই।

একো দেবো সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

সেই সর্ব্বব্যাপী একই দেব (পরমাত্মা) সর্ব্বভূতের বুদ্ধি-গুহায় অদৃশ্যরূপে অবস্থিত, সুতরাং তিনিই সমস্ত ভূতের অন্ত-রাত্মা এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ। আকাশ যেমন ঘটাদিসম্বন্ধাধীন বিভক্তরূপে (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) প্রতিভাত হয়, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধ্যাদি উপাধিসম্বন্ধের দ্বারা বিভক্তের ন্যায় (পৃথক্ প্রায়) প্রতিভাত হন। এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ, যথা—সেই এই ব্রহ্ম আত্মা বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময় ইত্যাদি। এই শাস্ত্র একই সত্যের (ব্রহ্মের) বুদ্ধ্যাদিময়ত্ব বলিতেছেন। বিজ্ঞানময় ইত্যাদি শব্দের অর্থ, তৎপ্রাচুর্য্য—অথবা তৎপরতন্ত্র প্রকাশ। জীবের যাহা যথার্থরূপ, তাহা বিস্পষ্ট অর্থাৎ বিজ্ঞান গোচর না হওয়ায়, বুদ্ধ্যাদির সহিত একী-ভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন তদ্ভাবাপত্তি হওয়া, যেমন—অমুক লোক স্ত্রীময় অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি অধিক অনুরক্তিবশতঃ স্ত্রীবশ। উক্ত শ্রুতি স্মৃতিবাক্য জীবের জীবত্ব নিষেধ করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অপিচ শ্রুতিতে পরিপঠিত—

সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

এই সমস্তই ব্রহ্ম।

আত্মা বা ইদমগ্রমাসীৎ। নান্য কিঞ্চনমিষৎ।

আদিতে এই জগৎ আত্মাই (ব্রহ্ম) ছিল। অন্য কিছুই ছিল না।

এই সকল শ্রুতি অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া, অনন্তর তৎপ্রতিপাদনার্থ "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহাবাক্য উপদেশ করায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভেদঘটিত স্বামীভৃত্যভাবে কি অন্যভাবে ঐ সকল শ্রুতির অল্পমাত্রও তাৎপর্য্য নাই।

আরও দেখ, "তৎসৃষ্ট্বাতদেবানুপ্রাবিশৎ" তিনি সৃজন করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। এই শ্রুতি স্বসৃষ্ট সংঘাতে (দেহে) অবিকৃত পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশ উপদেশ করিয়াছেন। দু-একটি ভেদশ্রুতি আছে সত্য; পরন্তু সেগুলিও ঔপচারিক অর্থ ব্যক্ত করে। একের ঔপচারিকত্বে অন্যের মুখ্যতা, এই নিয়ম অনুসারে সেই সকল ভেদশ্রুতিও অভেদ-অর্থ প্রতিপাদন করিবে। অদ্বয় ব্রহ্মবাদেই নিষ্কলম্, নিষ্ক্রিয়ম্, শান্তম্, নিরবদ্যম, নিরঞ্জনম্ ইত্যাদি শ্রুতি সাধুরূপেই সঙ্গত হয়।

"তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের এক দেশ" অর্থাৎ তত্ত্বমসি বাক্য মহাবাক্য মধ্যে পরিগণিত নয়; তাহা বেদের এক দেশ অর্থাৎ প্রাদেশিক বাক্য। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে এইরূপ বলেন, তাহা শাস্ত্র এবং যুক্তির বিরোধী। কারণ স্বয়ং সূত্রকার ব্যাসদেব এই বেদোক্ত তত্ত্বমসি বাক্য অবলম্বন করিয়াই সাংখ্যের অচেতন প্রধান কারণবাদ খণ্ডন করিয়া চেতন ব্রহ্ম কারণবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সাংখ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই সৎকে অচেতন প্রধান

বলেন। কিন্তু শ্রুতি "স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো"—হে শ্বেতকেতু! তাহাই আত্মা এবং তাহাই তুমি—সতে আত্ম শব্দ প্রয়োগের দ্বারা চেতন ব্রহ্মকারণবাদই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সাংখ্য যদি বলেন, অচেতন প্রধানেও আত্মা শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন রাজার সর্ব্বার্থকারী ভৃত্যের প্রতিও আত্মা শব্দের প্রয়োগ হয়, "অমুক আমার আত্মা।" সেইরূপ আত্মার সর্ব্বার্থকারিণী প্রকৃতির প্রতিও আত্মা শব্দের প্রয়োগ হয়, "জগৎকারণ সৎ আত্মা"। ভৃত্য যেমন সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাজার উপকার করে, তদ্রূপ প্রধানও ভোগও মোক্ষ বিতরণ করতঃ আত্মার অর্থাৎ পুরুষের উপকার করিয়া থাকে। সুতরাং অনাত্মা প্রধানই শ্রুতিস্থ সৎ শব্দের গৌণ অর্থ।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৮ "হেয়ত্বাবচনাচ্চ" সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনাত্মা প্রধান যদি শ্রুতিস্থ সৎ শব্দের গৌণ অর্থ হইতে এবং প্রধানকেই যদি "তৎ ত্বম্ অসি"—'তাহাই তুমি'—এই বাক্যের দ্বারা চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইত, তাহা হইলে শ্বেতকেতু সেই উপদেশ শ্রবণে অনাত্মজ্ঞ থাকিতেন। অপিচ শ্রুতি তাঁহাকে মুখ্য আত্মা বলিবার নিমিত্ত প্রথমোপদিষ্ট গৌণ আত্মার ত্যাজ্যতা বলিতেন। যেমন, অরুন্ধতী দেখাইবার ইচ্ছায় অরুন্ধতী তারার নিকটস্থ স্থূল তারাকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইয়া পশ্চাৎ তাহা অরুন্ধতী নহে বলিয়া প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক প্রকৃত

অরুন্ধতাকে দেখান হইয়া থাকে। শ্রুতি সেরূপ পথবর্ত্তিনী না হওয়ায় গৌণ আত্মার উপদেশ করেন নাই, একেবারেই মুখ্য আত্মার উপদেশ করিয়াছেন। সেরূপ উপদেশ করিলে গৌণ উপদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া মুখ্য উপদেশ করিতেন।

ইহা সাংখ্যের প্রধান কারণবাদের প্রতিবাদ হইলেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জীবব্রহ্মের ভেদবাদী অন্যান্য বৈদান্তিক-গণ যে বলেন,—অভেদ "তত্ত্বমসি" বাক্যের মুখ্যার্থ নহে, ঔপচারিক ; লোকে যেমন অমাত্যকেও রাজা বলে, তেমনি শ্রুতি চৈতন্যাংশে ব্রহ্ম স্বভাবের সাদৃশ্য আছে জীবকেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। "তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ" ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদের অভিপ্রায় শ্রুতির অনুকূল হইলে, শ্রুতি অরুন্ধতি ন্যায় অবলম্বন করিতেন। তাহা না করায় জীব-ব্রহ্মের অভেদার্থে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? আমরা বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং শঙ্করসিদ্ধান্তই যে ধ্রুব সত্য, তাহা নিঃসন্দেহেই গ্রহণ করিতে হইবে। আরও দেখ; শুধু অমাত্য-কেও রাজা বলা নয় ; আমরা সময় বিশেষে তহশীলদারকেও রাজা বলিয়াছি। কোন বালক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছি যে, ইনি আমাদের রাজা কর আদায়ে আসিয়াছেন। কিন্তু সেই বালক যদি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে, ইনি কে ? তখনও কি আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত না বলিয়া বালককে অজ্ঞতার অন্ধকারেই রাখিব ? শ্বেতকেতু 'আবার বলুন, বুঝাইয়া দিন,' এইভাবে নয়বার প্রশ্ন করিলেও গুরুপিতা অরুন্ধতী-ন্যায়

অবলম্বন না করিয়া, নানা উদাহরণ দিয়া তাঁহার সেই আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিয়া জগতের মূল কারণ 'সেই সৎই আত্মা এবং তাহাই তুমি' প্রতিবারে এই একই উত্তর দিয়াছেন। ইহাতে শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে। ইহাই বেদান্তশ্রুতির হৃদয় বা বেদান্তনিহিত রহস্য।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাই জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের অভিমত। অবশ্য আমার মত লোকের তাঁর বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারের অত্যল্প অংশমাত্রও পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়; তথাপি আমার এই কয়টি কথাতেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। আচার্য্যদেব উক্তরূপে শ্রুতিরহস্য অনুভব করতঃ অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তীর্ণভাষ্য প্রস্তুত করিয়া ইহলোক সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভাষ্যের নাম শারীরকমীমাংসা-ভাষ্য। ভাষ্যমধ্যে তিনি উপরোক্ত তত্ত্বের অনুকূলে নানা যুক্তি, নানা উদাহরণ, নানা প্রমাণাদি বিন্যস্ত করিয়াছেন। বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হইবার জন্য যে সকল কার্য্য করিতে হয়, বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যের উপকরণ, শ্রুতিবিচারের প্রণালী, সাধনরহস্য; উপাসনাতত্ত্ব; কর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনানিবিষ্ট ব্যক্তির উচ্চাবচফল, জীবন্মুক্তি, ক্রমমুক্তি ও নির্ব্বাণ মোক্ষ এই সমস্তই বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গাগত স্বর্গনরকাদির ফলভোগের কথাও বলিয়াছেন। নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম একরূপ, একরস, অদ্বয়, তাঁহার আর কোন রূপবিশেষ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই।

বৃক্ষস্য স্বগতভেদ পুষ্পপত্র ফলাঙ্কুরৈঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় শিলাদিতঃ॥

বৃক্ষ হইতে পুষ্প, পত্র, ফল, শাখাপ্রশাখার যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ, বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ; এবং বৃক্ষ হইতে শিলা প্রভৃতির যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। এইরূপ কোন ভেদ পরব্রহ্মে নাই। সুতরাং এই ভেদ প্রতিভাস (বিশ্ব) মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা।

শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণবাদের উপর দোষারোপ করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য বলেন,—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাকে আবৃত্তিরহিত পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। তাহাই শাস্ত্রান্তরের মোক্ষ। ধ্যানাদিসহকৃত ভক্তির দ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায়, অন্য উপায়ে নহে। ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া হয় না।

পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্যকার মধ্বাচার্য্য বলেন,—পরমসেব্য স্বতন্ত্রতত্ত্ব ভগবানের প্রসন্নতা লাভই অস্বতন্ত্র সেবক জীবের পরমপুরুষার্থ। কিন্তু তাহা ভগবদ্‌গুণোৎকর্ষজ্ঞান ব্যতীত হয় না। সে জ্ঞানতত্ত্বমস্যাদিবাক্য শ্রবণে জন্মে না। অঙ্কন নামকরণ ও ভজনের দ্বারাই তাহা লব্ধ ও স্থিরতর হয়। "তত্ত্বমসি" বাক্য "অগ্নির্ম্মানবক" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় সাদৃশ্য পর নির্ব্বাণ মুক্তি

বন্ধ্যা পুত্রাদির ন্যায় কথামাত্র, সারূপ্য সালোক্যাদি মুক্তিই পরমার্থ।

মধ্বাচার্য্য বলেন,—বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু মুমুক্ষু জীবের সেব্য, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য বলেন গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু জীবের সেব্য। মধ্ব বলেন, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিই মোক্ষ; বল্লভ বলেন, গোলোকস্থ পরমানন্দসন্দোহ বৃন্দাবনে ভগবদনুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডরাসরলাৎসবে নির্ভর সমাবেশে পতিভাবে ভগবান্‌কে সেবা করাই মোক্ষ। এতন্মতে জ্ঞানমার্গ কিছুই নহে; ভক্তিমার্গ ও উৎকৃষ্ট নহে, প্রীতমার্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শঙ্কর দ্বৈতবাদীদিগের কথিতপ্রকার মুক্তিকে স্বর্গমধ্যে গণনা করেন। বিশিষ্টদ্বৈতবাদী রামানুজ ও শুদ্ধ দ্বৈতবাদী বল্লভ প্রভৃতির অভিপ্রায় তাঁহার অনুমোদনীয় নহে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, যাবৎ না অদ্বয় ব্রহ্মাত্ম প্রতিপত্তি হয়, তাবৎ অমোক্ষ। ভগবৎ-সারূপ্য ও ভগবৎ-স্থান লাভ করিলেও কোন না কোন কালে তৎপরিচ্যুত হইতে হইবে। যেদিন তাহা ঘটিবে সেই দিনই আবার সংসার আসিবে। গীতায় আছে,—

যদ্‌ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

ভগবান বলিয়াছেন, যেখানে গেলে আর এই জড়জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না; তাহাই আমার পরমধাম। কিন্তু ভগবানের পার্শ্বচর জয়বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পরিচ্যুতি ঘটিয়াছিল। এবং ইহা শঙ্করচার্য্যের মনগড়া কথা নয়; শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই বাণী। অতএব, সালোক্য সারূপ্য এসকল

মুক্তি পরমমুক্তি নহে, ইহা গৌণ মুক্তি অর্থাৎ আপেক্ষিক মুক্তি। ঐ সকল মুক্তি কর্ম্মীদিগের মধ্যে স্বর্গনামে পরিচিত। মোক্ষের অন্য নাম অমৃত। যাহারা কর্ম্মপ্রভাবে দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ সন্দোহে অবস্থান করেন, শাস্ত্রপ্রশংসা করিবার জন্য তাঁহাদিগকেও অমৃতী অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ বলেন। অথচ তাহারা প্রকৃত মুক্ত নহে। মোক্ষ উৎকর্ষাপকর্ষশূন্য একরূপ ও একরস; সুতরাং তাহা অদ্বয়। অদ্বয় ব্যতীত সদ্বয়ে সংসার-ভয় নিবারিত হয় না, ইহা শ্রুতি উচ্চৈরবে বলিয়াছেন। "দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ন্তবতি" ইত্যাদি।

সেব্যসেবকভাবেই বল, আর গোপীভাবে ভগবানের ভজনা করাই বল, সবই স্পন্দনাত্মক ব্যাপার। কিন্তু মহাপ্রলয়ে স্পন্দনাত্মক কোন কিছু ছিল বলিয়া কোন শ্রুতিপ্রমাণ নাই, মাত্র এইটুকু জানিয়া রাখিলে আর ঐ সব মতবাদে বিভ্রান্ত হইতে হইবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শঙ্করাচার্য্যের মত বৈদিক ধর্ম্মের এমন শক্তিশালী ও মহান্ প্রচারক বুদ্ধের আবির্ভাবের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। একথা কেন বলিয়াছি? শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করুন। বৌদ্ধরাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়নিশান কিরূপ দৃঢ়ভাবে ভারতের মাটীতে প্রোথিত হইয়াছিল। তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করুন। আরও দেখুন, বৌদ্ধ বিহারের আধিক্য

নিবন্ধন, ভারতবর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তার পূর্ব্বতন নাম পরিত্যাগ করিয়া বিহার নাম ধারণ করিয়াছে।

"অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ।" ডি. এল. রায়ের এই বৌদ্ধ যুগের ভারত বর্ণনায়।

ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ স্থপতিগণের স্থাপত্য নিদর্শনে, গিরিগুহায় ও প্রস্তরে ক্ষোদিত বৌদ্ধ অনুশাসনে, এমন কি এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোক এখনও যেসব স্থানে প্রবেশ লাভে অসমর্থ হইয়াছে সেইসব দুরধিগম্য প্রদেশেও বৌদ্ধ স্থাপত্য, বৌদ্ধ অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর ব্যাপকত্ব সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু আজ ভারতে বৌদ্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যুগান্তর কে আনিয়াছেন? যে বুদ্ধদেবের চরণে অর্দ্ধ-জগত প্রণতি নিবেদন করে, সেই বুদ্ধের প্রচারিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বহুবিস্তৃত, জনপ্রিয় ধর্ম্ম আজ ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত। স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে নিশ্চিতরূপে জানা যাইবে যে, এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের মূলে আছেন জগদ্বরেণ্য আচার্য্য-প্রবর শঙ্কর। ইহা কবির কল্পনাবিলাস নয়, ঐতিহাসিক সত্য।

বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিবিদ্, বিশিষ্ট সমালোচক স্বাধীন ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার "ভারত সন্ধান" নাম পুস্তকে (১৯৪৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর এই পুস্তক প্রকাশিত হয়) লিখিয়াছেন—আট বছর কি দশ বছর আগে যখন আমি প্যারিসে গিয়াছিলাম,

আঁদ্রে ম্যালরো আলাপ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, সেটা কি যার বলে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে কোনো গুরুতর সংগ্রাম ব্যতীত হিন্দুধর্ম্ম সুব্যবস্থিত, বহুবিস্তৃত, জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত করতে পেরেছিল ; বহু দেশের ইতিহাস ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে কুৎসিৎ হয়েছে ; এরূপ কিছু ঘটতে না দিয়ে হিন্দুধর্ম্ম কেমন করে এত বিপুল এবং বহুবিস্তৃত জনপ্রিয় বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে ? এখনও কি ভারতের সেই শক্তি বর্ত্তমান আছে ; যদি থাকে তবে তার স্বাধীনতা ও মহত্ত্ব সুনিশ্চিত।

ম্যালরো যে এই প্রশ্ন করেছিলেন তা কেবল জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় নয়। তাঁর মন ঐ প্রশ্নে পূর্ণ ছিল। তাই আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে কথাটা তুললেন। কিন্তু তাঁকে ও নিজেকে দেবার মত কোনো সন্তোষজনক উত্তর আমার ছিলনা। ছোটোখাটো দুচারটি কারণ দেখিয়ে তিনি এই কারণটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন,—অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের একজন শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক ও ধর্ম্মপ্রচারক শঙ্করাচার্য্য হিন্দু সন্ন্যাসীদের জন্য বৌদ্ধদের পুরাতন সঙ্ঘের অনুরূপ মঠ স্থাপন করতে আরম্ভ করেন ; পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে এরূপ কোনো ব্যবস্থা ছিলনা, যদিও ছোটো ছোটো মণ্ডলী ছিল।

তিনি আরও লিখেছেন,—শোনা যায় শঙ্কর সুবিস্তৃত ধর্ম্মরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান ঘটাতে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

এখন পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তর পশ্চিমে সিন্ধুতে নিকৃষ্টরূপের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে। বহু বিস্তৃতরূপে ঐ ধর্ম্ম ভারতে আর দেখা যায় না।

এখানে বক্তব্য এই যে—আঁদ্রে ম্যালরো যে প্রশ্ন করেছিলেন, এবং তৎপুর্ব্বে নেহেরুজীর মনেও যে প্রশ্ন উঠেছিল, শঙ্করের বিরুদ্ধ সমালোচনামুখর পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য আমার মনেও ঠিক ঐরূপ প্রশ্নই উঠেছিল। অতীত এবং বর্ত্তমান ইতিহাসের সহিত বিশেষ কিছু সম্পর্ক না থাকিলেও মোটামুটি জ্ঞান অনুসারে তার উত্তর দিবার চেষ্টাও করিয়াছি এবং বিস্মিত হয়ে দেখিয়াছি যে তাহা নেহেরুজীর প্রায় অনুরূপই হয়েছে।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিবার পর, এই পুস্তকপাঠের সুযোগ আমি লাভ করি। শঙ্করের অসাধারণ মেধাশক্তি, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার লোকসংগ্রহের যাদুকরী শক্তি প্রমাণে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া নেহেরুজীর শঙ্কর সম্বন্ধে উক্তিগুলি উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—শঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গীতে ও দর্শনে জগৎকে অস্বীকার করার ভাব দেখা যায়, এবং তিনি যে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আত্মার স্বাধীনতালাভকেই চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন, সেজন্য সাধারণ জীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর দিকেই ঝোঁক দিয়েছেন। তাছাড়া স্বার্থত্যাগ ও বৈরাগ্যের দিকেও ক্রমাগত জোর দিয়েছেন।

তবুও শঙ্কর বিপুল কর্ম্মশীল, শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। নিজের মধ্যে আত্মগোপন করবেন, কিম্বা বনের মধ্যে একটা ঝোপ বেছে নিয়ে অন্যদের কথা ভুলে নিজের ব্যক্তিগত সার্থকতা লাভে তৎপর হবেন এরূপ কাজ এড়িয়ে যাবার পাত্র শঙ্কর ছিলেন না।

ভারতের সুদূর মালাবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি অবিরাম ভারতময় ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং অসংখ্য লোকের সঙ্গে তর্ক করেছেন, বিচারযুক্তি দেখিয়েছেন। অসংখ্য লোককে বুঝিয়ে নিজের মতে এনেছেন এবং আপন অনুরাগ ও প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা সকলকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

শঙ্কর আপনকার্য্য সম্বন্ধে সদাজাগ্রত ছিলেন এবং কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এই সমস্ত ভূখণ্ড সংস্কৃতি-সূত্রে একত্র গ্রথিত ও একই প্রেরণায় প্রাণবন্ত, বাইরে যতই বিভিন্নরূপ গ্রহণ করুক না কেন। তাঁর সময়ে যে সব বিভিন্ন চিন্তাধারা মানুষের মনকে ব্যস্ত করে রেখেছিল, তিনি সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট করে দেশের দৃষ্টি ভঙ্গীতে ঐক্য আনার চেষ্টা করেছেন।

আচার্য শঙ্করের বত্রিশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি বহুদীর্ঘ জীবনের কাজ করে গেছেন, এবং ভারতের উপর তাঁর প্রবল চিন্তাশক্তি ও শক্তিমান্ ব্যক্তিত্বের এমন ছাপ রেখে গেছেন যে তা আজও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে আছে।

একাধারে তাঁর মধ্যে বিচিত্র সম্মিলন ঘটেছিল, কারণ তিনি ছিলেন দার্শনিক ও পণ্ডিত, অজ্ঞেয়বাদী ও মরমী, কবি ও ঋষি, আর এছাড়া প্রকৃত সংস্কারক ও কুশল ব্যবস্থাপক। শঙ্কর-রচিত শিবাষ্টক, গঙ্গাস্তোত্র, মোহমুদ্গর প্রভৃতি স্তবস্তোত্রগুলি এতই সুললিত, প্রাঞ্জল ও কবিত্বপূর্ণ যে আজও এগুলি প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে পরম আদরের ও পরম গৌরবের বস্তু। বলতে গেলে শঙ্করের এই সব রচনার তুলনা নাই।

শঙ্কর বর্ণভেদের ভিত্তিতে হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা স্বীকার করেছিলেন এই যুক্তিতে যে এতে জাতির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সমষ্টিগত হয়ে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তিনি এই কথাও বলে ছিলেন, যে-কোন বর্ণের যে-কোন জাতি সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য তিনি দশটি শাখা স্থাপিত করেছিলেন। এখনও তার চারটি শাখা বর্ত্তমান আছে। তিনি চারিটি বিশাল মঠ স্থাপন করেছিলেন, দূরে দূরে—ভারতের প্রায় চার কোণে। হিন্দুধর্ম্মের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী শঙ্করমতে নিয়ন্ত্রিত। অষ্টম শতাব্দীর শঙ্করের পর আর কোনো উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নি।

শঙ্করবিরোধিগণ, শঙ্করমতের অসারত্ব প্রমাণে ও স্ব স্ব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করিতে পারেন; কিন্তু নেহেরুজীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনাগুলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়

যে, ঐ ঐ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণ শঙ্করের মত শক্তিশালী হইলে ভারতবর্ষে পাকিস্থানের কল্পনাই হইত না। অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গকে আমরা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাইতাম না।

যাঁর অলৌকিক কার্য্যকলাপ মনীষিবৃন্দের বিশেষ বিস্ময়ের, যাঁর ভাষ্যকিরণে বৌদ্ধবাদ অন্ধকার রাশি অপসারিত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, সেই জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদী"—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

—::—